The Global Journal of Contextual Thought

(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)

Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে কর্মবাদ: একটি দার্শনিক ও নৈতিক বিশ্লেষণ

Sangita Roy

M.A in philosophy. Rabindra Bharati university

Email id : *roysangita641@gmail.com*

DOI: https://doi.org/10.70798/tgjct/010400068

সারসংক্ষেপ

ভারতীয় দর্শন ভারতে বসবাসকারী মানুষের সামগ্রিক তত্ত্বচিন্তার দর্শন।মাধবাচার্য বলেছেন ভারতীয় দর্শন হলো ভারতীয়দের দর্শন। তবে কেবল তত্ত্ব আলোচনা ভারতীয় দর্শনে প্রাধান্য পায়নি। তত্ত্বজ্ঞানের আলোকে জীবন কে পরিচালিত না করলে সেই জ্ঞান অর্জনের কোন অর্থ থাকে না। জৈন, বৌদ্ধ ন্যায়,মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শন নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবন পরিচালনার মার্গ দর্শন করিয়েছেন। ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে কর্ম শব্দটি ধর্ম অর্থেও প্রযুক্ত হয়েছে। নীতিসম্মত কর্মই ধর্ম। বর্ণ ও আশ্রম অনুসারেও কর্মের বিভাজন করা হয়। এই সব কর্ম ব্যক্তির অবশ্য পালনীয়। সকল দর্শনেরই লক্ষ্য একটাই মোক্ষ বা মুক্তি লাভ। কিন্তু মোক্ষ বা মুক্তি লাভ কিভাবে হবে? চার্বাক ব্যাতীত অন্য সকল দর্শনই কর্মবাদের নৈতিক নিয়ম কে মেনে নিয়েছেন। কর্ম করলে মানুষ কে ব্যতিক্রমহীন ভাবেই ফলভোগ করতে হবে। ভালো কর্মে পুন্য, মন্দ কর্মে পাপ সঞ্চিত হয়। আবার কামনা বাসনা শূন্য কর্ম ব্যক্তির মুক্তি লাভের সহায়ক হয় সুতরাং ব্যক্তির কর্মের মধ্যেই তার বন্ধন অথবা মুক্তির উপায় রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে ভারতীয় নীতি শাস্ত্রে কর্মবাদের ধারণা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

সাংকেতিক শব্দ : *কর্মফল,নিষ্কাম কর্ম,অদৃষ্ট,অপূর্ব, কৃতপ্রণাশ, অকৃতাভ্যাগম*

ভূমিকা:

ভারতীয় দর্শনে কর্মবাদ একপ্রকার নৈতিক নিয়মের অপর প্রতিষ্ঠিত। এই নিয়মটি হলো কার্যকারণবাদ। কার্যকারণ সম্পর্কে বলা হয় কর্ম করলে অবশ্যই তার ফল পেতে হবে। ভালো কর্ম করলে যেমন ভালো ফল পেতে হবে। মন্দ কর্ম ও মন্দ ফল প্রসব করবে এবং ব্যক্তিকে তা ভোগ করতে হবে। এর ব্যতিক্রম সম্ভব নয়।এই কর্ম বাদ বিভিন্ন দর্শনে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন বৈদিক দর্শনে একে বলা হয়েছে ঋত। আবার ন্যায় ও মীমাংসা দর্শনে যথাক্রমে অদৃষ্ট ও অপূর্ব নামে পরিচিত। প্রতিদিনের জীবনে খেয়াল করলে আমরা দেখতে পাই কোন ব্যক্তি খুবই গরিব, কেউ আবার ধনী। কেউ উন্নত স্বাস্থ্যের অধিকারী, কেউ আবার কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত । কখনো আবার দেখি ধর্মজ্ঞানী মানুষ সমাজে অশেষ দুঃখ কষ্ট পান আবার আধার্মিক ব্যক্তি বিলাসবহুল জীবন কাটায়। এই বৈষম্য প্রশ্ন তোলে এমন বৈপরীত্যের কারণ কি? ভারতীয় দার্শনিকেরা বলেন এর কারণ হলো পূর্বজীবনের কর্ম। বাহ্যজগতে আমরা দেখি কারণ উ□পন্ন হলে কার্য অবশ্যই ঘটে যেমন বৃষ্টি হলে মাটি ভেজে। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়। পার্থক্য এই যে এই সব ক্ষেত্রে কার্য ও কারণের মধ্যে খুব বেশি সময়ের অপেক্ষা থাকে না। কিন্তু কর্মবাদে কৃতকর্ম ফল প্রসব করতে দীর্ঘ সময় নেয়। পূর্ব জন্মের কর্মফল ভোগ করার জন্য ব্যক্তিকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়। এখন প্রশ্ন ব্যক্তিকে তার কর্মের ফল কে প্রদান করে? ভারতীয় দর্শনে চার্বাক ছাড়া প্রায় সব দর্শন সম্প্রদায় কর্মবাদ স্বীকার করেছে। কিন্তু ব্যক্তিকে কর্মফল কে প্রদান করে এই প্রশ্ন কে কেন্দ্র করে দর্শন সম্প্রদায় গুলোর মধ্যে মতের ভিন্নতা আছে। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে **কর্মফল দাতা কে - প্রকৃতি না ঈশ্বর?**আরো একটি প্রশ্ন এখানে উত্থাপিত হয় তা হলো **কর্ম কি এক প্রকার নৈতিক বাধ্যবাধকতা ?** অর্থা□ মানুষের কর্ম কি তার স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ নয়? আলোচনার মধ্যে দিয়ে আরো যে প্রশ্নটির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করবো তা হলো **কর্ম কি কেবল বন্ধনের কারণ না মুক্তির সিঁড়ি?**

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

কর্মের সংজ্ঞা ও স্বরূপ :

কর্ম শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'কৃ' ধাতু থেকে যার অর্থ হলো কিছু করা। অর্থা একটি কার্য কে বোঝানো হয়। যা কিছু করা হয় তাই কর্ম। মানুষের সমস্ত কর্মই কোন না কোন ফল প্রসব করে। কর্মফল তিন রকম। ভালো, মন্দ এবং মিশ্র। ভালো কর্মের ফল ভালো, মন্দ কর্মের ফল মন্দ। আবার আংশিক ভালো ও আংশিক মন্দ কর্ম মিশ্র ফল উপন্ন করে। জগতের প্রতিটি প্রাণী বেঁচে থাকার তাগিদে কর্ম করে চলেছে। কর্ম না করলে জীবন নির্বাহই সম্ভব হয় না। কর্ম রহস্য উদ্ঘাটিত হলে ব্যক্তি আর কর্ম বন্ধনের মায়া জালে আবদ্ধ হয় না। **স্বামী বিবেকানন্দ বলেন 'সকাম কর্ম অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম করাই বুদ্ধিমানের।'** কারণ কামনাযুক্ত কর্ম ফল প্রসব করবেই। আর তা ভোগ করার জন্য ব্যক্তি কে জন্ম নিতে হবে। ফলাসক্তিশূন্য কর্ম ব্যক্তিকে মোহ, মায়া, লোভ থেকে মুক্ত করায় মানুষ নিঃস্বার্থ ভাবে কর্ম করে সকল বন্ধন থেকে মুক্তি পায়।

জন্মান্তরবাদ :

কর্ম করলে ব্যক্তিকে তার ফল অবশ্যই পেতে হবে। যে ব্যক্তি যে কর্ম করবে তাকেই তার ফল ভোগ করতে হবে। অন্য কেউ তার ফল ভোগ করতে পারে না। প্রথমটির লঙ্ঘন হলে কৃতপ্রণাশ দোষ হয়। কৃত অর্থা যা করা হয়েছে আর প্রণাশ অর্থে বিনষ্ট হওয়া। কর্ম যদি ফল প্রসব না করে বিনষ্ট হয় তবে নৈতিক নিয়মের লঙ্ঘন হয়।অন্য দিকে যে ব্যক্তি যে কর্ম করেনি তাকে যদি তার ফল প্রদান করা হয় তবে অকৃতাভ্যাগম দোষ হয়। অকৃত অর্থে যা করা হয়নি এবং অভ্যাগম অর্থে এসে উপস্থিত হওয়া। এমনটা সম্ভব নয় কারণ তা ও নৈতিক নিয়মের বিরোধী । তাই ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে জন্মান্তরবাদ কে স্বীকার করতে হয়। কারণ কর্ম করলে যদি ফল পেতেই হয় এবং বর্তমান জীবনে যদি সেই ফলপ্রাপ্তি সম্ভব না হয় তবে ফল ভোগের জন্য মানুষ কে জন্ম নিতে হবে। এই সত্য কে অস্বীকার করা যায় না। ধর্মজ্ঞানী অথবা আধার্মিক মানুষের বর্তমান জীবনের কর্ম ও ফলের মধ্যে যে বৈষম্য আমরা লক্ষ্য করি তার কারণ হলো এই যে সে তার পূর্ব জন্মের নিঃশেষিত কর্ম ফল ভোগ করছে। এভাবে বর্তমান জীবন ঠিক করে দেয় পরবর্তী জীবন কেমন হবে আবার পূর্ব জীবনের ভালো মন্দ কর্ম অনুসারে বর্তমান জীবন নির্ধারিত হয়।

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে কর্মের বিভাগ :

ভারতীয় নীতিশাস্ত্রে কর্মকে মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১) অনারব্ধ কর্ম ২) আরব্ধ কর্ম বা প্রারব্ধকর্ম।

অনারব্ধ কর্ম আবার দু'রকমের ।১) প্রাক্তন বা সঞ্চিত কর্ম ২) ক্রিয়মান বা সঞ্চয়মানকর্ম।

পূর্ব জন্মে অথবা বর্তমান জন্মে যে সমস্ত কর্ম করা হয়েছে অথচ তা ফল প্রসব করেনি সেই কর্মকে যথাক্রমে সঞ্চিত কর্ম ও সঞ্চয়মান কর্ম বলা হয়।অন্যদিকে পূর্ব জীবনে অথবা বর্তমান জীবনে যে সমস্ত কর্ম তার ফল প্রসব করা শুরু করে দিয়েছে তাদের বলে আরব্ধ বা প্রারব্ধ কর্ম।

কর্মনিয়ম বন্ধন না মুক্তি :

কর্ম করলেই যদি ব্যক্তিকে ফল পেতে হয় এবং ফল প্রাপ্তির জন্য পুনঃ পুনঃ জন্ম নিতে হয় তাহলে যে প্রশ্নটি স্বাভাবিক ভাবে উঠে আসে তা হলো মানুষের কি এই জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি নেই? ভারতীয় দর্শন বলে অবশ্যই মুক্তি সম্ভব। কিন্তু তা ও অর্জন করতে হবে কর্ম দিয়েই। আবার প্রশ্ন আসে কিন্তু কর্ম করলেই যে বন্ধন! ভারতীয় দর্শন এর উত্তরে বলে 'না'। কর্ম করলেই বন্ধন ব্যাপারটা তেমন নয়। ফলাকাঙ্খা যুক্ত কর্মই বন্ধনের কারণ। ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত কর্ম মুক্তির সোপান। শ্রীমৎভগবত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই অর্জুন কে বলছেন 'কর্মন্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন'। (শ্রীমৎভগবতগীতা। সাংখ্যযোগ। ২/৪৭)

অর্থা কর্মেই কেবল ব্যক্তির অধিকার, ফলাফলে নয়। ফলাকাঙ্খাযুক্ত কর্মকে ভারতীয় দর্শনে সকাম কর্ম এবং এবং ফলাফল বিবর্জিত কর্মকে ভারতীয় দর্শনে নিষ্কাম কর্ম বলা হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ভারতীয় দর্শন অদৃষ্টবাদী নয়। কর্ম নিয়ম মানুষের অতীত, বর্তমান, ও ভবিষ্য জীবন নির্ধারণ করলেও মানুষের কর্মের স্বাধীনতাকে হরণ করে না। মানুষের কর্মই ঠিক করে দেয় তার ভাগ্য। মানুষ তার স্বাধীন ইচ্ছায় সকাম অথবা নিষ্কাম কর্ম করে বন্ধন অথবা মুক্তি পেতে পারে।

নিষ্কাম কর্মের গুরুত্ব :

কামনা শূন্য কর্ম ই ব্যক্তিকে জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তি দিতে পারে। চার্বাক ব্যতীত ভারতীয় দর্শনের সকল সম্প্রদায়ই মোক্ষবাদী। তাই সব দর্শন সম্প্রদায়ই নিষ্কাম কর্মকে গুরুত্ব দিয়েছে। জৈন দর্শন মতে নিষ্কাম কর্মই জীবকে পুদ্গল বন্ধন থেকে মুক্ত করে। বৌদ্ধ দর্শনে নিষ্কাম কর্মকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের আটটি মার্গের উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে কর্ম সম্পাদন করলে জীবৎকালেই মানুষ নির্বাণ লাভ করতে পারে।

কর্মবাদ সম্পর্কে বিভিন্ন দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি :

চার্বাক দর্শন : চার্বাক দর্শনে কর্মবাদ স্বীকার করা হয়নি। **চার্বাক মতে কার্য ও কারণের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই।** প্রকৃতি রাজ্যে সমস্ত ঘটনা ঘটে আকস্মিক ভাবে অথবা চতুর্ভূতের স্বভাব নিয়মে। কোন্ কারণ থেকে কোন্ কার্য ঘটবে তার কোন ধরাবাধা নিয়ম। অনুরূপ কথা বলেন পাশ্চাত্য দার্শনিক ডেভিড হিউম। তাঁর মতে কার্য কারণের মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় আসলে এক ধরণের অভিজ্ঞতাজাত অভ্যাস।

জৈন দর্শন : জৈন দর্শনে কর্ম কে বলা হয়েছে পুদগল। পুদগল মানে জড়ানু।জীব স্বরূপত নিত্য, শুদ্ধ ও মুক্ত। বাসনাযুক্ত কর্ম জীবের প্রতি পুদগলকে আকৃষ্ট করে। ফলে জীব কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়। প্রথম অবস্থায় জীবের মধ্যে ক্রোধ মান মায়া লোভ ইত্যাদি ভাবের উন্মেষ হয়। একে জৈন দর্শনে বলা হয়েছে কষায়। কষায় এর প্রভাবে জীব আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হয়। একে বলা হয় ভাববন্ধন। এর পর জীব জড়ীয় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জড়বৎ অবস্থান করে। একে বলা হয় দ্রব্যবন্ধন। যে উপায় জীব কর্ম পুদগল বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাকে বলা হয় আস্রব। কিন্তু বন্ধনই অন্তিম পরিণতি হয়। নিষ্কাম কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে জীব নিজেকে পুদগল বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে। যে উপায়ে জীব নিজেকে কর্মপুদগল বন্ধন থেকে মুক্ত করে তাকে বলা হয় সংবর। **'আস্রবঃ ভবহেতুঃ সংবরঃ মোক্ষকারণম্'।** তবে সংবর আত্মাতে নতুন কর্ম পুদগল প্রবেশ করতে না দিলেও পূর্বার্জিত কর্ম পুদগল তখনও থাকে। সম্যকদর্শন সম্যকজ্ঞান ও সম্যকচরিত্রের(ত্রিরত্ন)অনুশীলনের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি হলে জীব সকল পুদগল বন্ধন থেকেই মুক্ত হয়। যে উপায়ে জীব তার সঞ্চিত কর্ম পুদগল বন্ধন থেকে মুক্ত হয় তাকে বলা হয় নির্জরা।

বৌদ্ধ দর্শন : বৌদ্ধ দর্শন ক্ষণিকত্ববাদী। বৌদ্ধ মতে কোন বস্তু এক ক্ষণের বেশি থাকে। প্রতি ক্ষণের বস্তু সদৃশ অন্য একটি বস্তু উৎপন্ন করে বিনষ্ট হয়। দুই ক্ষণের বস্তুর মধ্যে লক্ষণগত অভিন্নতা নেই। বস্তু হলো স্বলক্ষণের ধারা।স্থিরদ্রব্য রূপে আত্মা নেই। এখন প্রশ্ন প্রতি ক্ষণের আত্মা যদি ভিন্ন হয় তবে জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ কোন যুক্তিতে তারা স্বীকার করছেন? এর উত্তর হলো **'সংস্কার এবং ধারাবাহিকতা** । সংস্কার বলতে পূর্ব জন্মের অভিজ্ঞতার ছাপ। একটি দীপশিখা যেমন একের পর এক দীপশিখা জ্বালিয়ে ধারা টিকে অব্যহত রাখে তেমন ভাবে প্রতিটি ক্ষণের সংস্কার পরবর্তী ক্ষনে ধারাবাহিক ভাবে অগ্রসর হয়। কর্মফলগ্রহীতা কর্মকর্তা থেকে উৎপন্ন সদৃশ ব্যক্তি সন্তান।

ন্যায়দর্শন : ন্যায়দর্শন কর্মবাদে বিশ্বাসী। ন্যায় মতে ব্যক্তিজীবনের বৈষম্য এর মূলে হলো কর্ম নীতি। বৈষম্য হলো কার্য। এবং কর্ম হলো কারণ। ন্যায় দর্শন অসৎ কার্য বাদী। ন্যায় মতে কার্য, কারণের মধ্যে আগে থেকেই উপস্থিত থাকে না। কার্য উৎপত্তির পূর্বে থাকে তার প্রাগভাব। প্রাগভাব বলতে বোঝায় কার্য উৎপত্তির পূর্বে উপাদান কারণে কার্যের অভাব। প্রাগভাব বিনষ্ট হলে কার্য উৎপন্ন হয়। কোন কর্ম (কার্য)সম্পাদন করার পর সেই কর্ম একপ্রকার শক্তি উৎপন্ন করে যাকে **ন্যায় দর্শনে বলা হয়েছে অদৃষ্ট। এই** অদৃষ্ট শক্তি যথা সময় ব্যক্তি কে তাঁর কর্ম অনুযায়ী ফল প্রদান করে। অদৃষ্ট শক্তি জড় হওয়ায় নিজে নিজে পরিচালিত হতে পারে না। এক সচেতন কর্তার প্রয়োজন হয়। অদৃষ্টের পরিচালক হিসেবে ন্যায় দর্শনে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হয়।

মীমাংসা দর্শন : মীমাংসা দর্শন বেদ নির্ভর।ধর্ম ও কর্ম শব্দ দুটি কে এখানে একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বর স্বীকার করা হয়নি। ধর্ম বলতে বোঝানো হয়েছে নীতিসম্মত কর্মকে। কল্যাণমূলক কর্ম ই ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করে। বেদ নির্দেশিত কর্মই ব্যক্তির কল্যাণ সাধন করে। মীমাংসা দর্শনে কর্মকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। ১)নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম এবং ২)কাম্য কর্ম। নিত্য কর্ম ও নৈমিত্তিক কর্ম বিষয়বাসনা বর্জিত কর্ম। নিত্য কর্ম বলতে বোধহয় এমন কর্ম যা প্রত্যহ পালনীয়।যেমন স্নান, সন্ধ্যা বন্দনা ইত্যাদি। আর নৈমিত্তিক কর্ম বিশেষ দিনে পালন করা বিধেয়। এইসব কর্ম পুন্যফল অর্জনের সহায়ক না হলেও, কর্মের অনুষ্ঠান না করলে পাপ হয়। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম সম্পর্কে সকল মীমাংসা সম্প্রদায় মোটামোটি এক মত। কিন্তু কাম্য কর্ম বিষয়ে তাদের মতে মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। কাম্য কর্ম বেদবিহিত। কুমারিল ভাট্ট কাম্য কর্ম কে ফল লাভের জন্য কর্ম হিসেবে গণ্য করলেও প্রভাকর মিশ্র একে কর্তব্যমুখী কর্ম হিসেবেই দেখেছেন। ভাট্ট মতে যাগ যজ্ঞ ইত্যাদি বেদবিহিত কর্মের উদ্দেশ্য স্বর্গলাভ করা। কাম্য কর্ম ফল প্রসব করে। কর্ম অনুষ্ঠানের সাথে সাথেই ফল প্রসব না করলেও এক প্রকার শক্তি উৎপাদন করে। যাকে **মীমাংসক গণ বলেন অপূর্ব।** ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রে অপূর্বই প্রত্যক্ষ কারন হয়ে থাকে।মীমাংসা অপূর্ব কে ফলাপূর্ব শক্তি বলেছেন। এই শক্তি ফল উৎপন্ন হওয়ার পূর্ব মুহূর্তটুকু থাকে। তারপরই বিনাশিত হয়।

The Global Journal of Contextual Thought
(A Double-Blind, Peer-Reviewed, Quarterly, Multidisciplinary Journal)
Volume: 1, Issue: 4Feb'26-Apl'26 Home Page: www.tgjct.orgEmail:editor@tgjct.org ISSN: 3107-7528(Online)

শঙ্করাচার্য : অদ্বৈতবেদান্তি শংকরাচার্য কর্মকে মুক্তি লাভের ক্ষেত্রে জ্ঞান লাভের সহায়ক হিসেবে গণ্য করেছে। জ্ঞানই হলো মুক্তির একমাত্র উপায়। **ব্যবহারিক স্তর পর্যন্ত ই এর কার্যকারিতা। যতদিন মায়ার প্রভাবে এই জগৎ কে সত্য বলে মনে হয় ততদিনই কর্ম থাকে।** পারমার্থিক স্তরে কর্ম অথবা কর্মফল কিছুই থাকে না। জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত হলেই সমস্ত কিছুই পরম ব্রহ্মতে বিলীন হয়ে যায়। চিওশুদ্ধ না হলে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। বেদবিহিত কর্মের মাধ্যমে চিত্ত শুদ্ধি সম্ভব। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের দ্বারা চিও শুদ্ধ হলে সাধন চতুষ্টয়ের মাধ্যমে চারটি অভ্যাস গঠন করতে হয়। এই সাধন চতুষ্টয় গুলো হলো - ১) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ২) ইহমূত্রার্থ-ভোগবিরাগ ৩) শমদমাদিসাধন ৪)মুমুক্ষত্ব। এই চতুর্বিধ অভ্যাসের মধ্য দিয়ে মোক্ষার্থী নিত্যবস্তুকে অনিত্য বস্তু থেকে পৃথক করে দেখে, ইহকাল ও পরকালের সমস্ত ভোগের প্রতি সে উদাসীন আচরণ করে , ইন্দ্রিয় গুলোকে যথাসম্ভব সংযত করে নিয়ে মোক্ষ লাভের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে, অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল হয়ে ওঠে, সকল প্রকার দৈহিক ও মানসিক সুখের প্রতি বৈরাগ্যের ভাব আসে, শাস্ত্র ও গুরু বাক্যের প্রতি একান্ত বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। এই সময় মোক্ষ লাভের বাসনা ছাড়া আর কিছুই মন কে অধিকার করতে পারে না। যা কিছু মুক্তিলাভের সহায়ক কেবল তাই মনকে অধিকার করে থাকে।এভাবেই ধীরে ধীরে শ্রবন, মনন ও নিদিধ্যাসনের পথে অগ্রসর হয়ে জীব মুক্তি লাভ করে।

রামানুজ : রামানুজ শাস্ত্রবিহিত কর্মকে নিত্য বলেন না। কারণ শাস্ত্র বিহিত কর্ম জীবকে সংসার থেকে মুক্ত করতে পারে না। ইষ্ট অথবা নিষিদ্ধ কর্ম জনিত ফল ভোগের পর তাকে আবার সংসারে ফিরে আসতে হয়। মুক্তি লাভের জন্য জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি তিনটেরই প্রয়োজন হয়। তবে জ্ঞান ও কর্ম মুক্তি লাভের সহায়ক। ভক্তিই প্রকৃত মুক্তি লাভের পথ। ঈশ্বরের করুনা ব্যতীত জীব মুক্তি লাভ করতে পারে না। যখন ব্যক্তির কর্মে ও ভাবনায় ঈশ্বর চিন্তাই একমাত্র বিষয় রূপে অবস্থান করে তখনই প্রপত্তি বা ভক্তি ভাবের প্রভাবে জীব ঈশ্বরের করুনা সুধা লাভ করে, ভববৈতরণী পার হতে পারে।

ব্যক্তিজীবনে কর্মবাদের প্রাসঙ্গিকতা :

ব্যক্তি জীবনে কর্মবাদ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এটি আমাদের নৈতিক ও সৎ চরিত্রের অধিকারী করে। কর্ম করলে তার ফল পেতেই হয় এই নৈতিক নিয়ম আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সাহায্য করে। যখন ব্যক্তি বুঝতে পারে তাঁর আজকের কর্ম তার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে তখন সে নিজের কর্মের প্রতি যত্নশীল হয়। কর্মফলের চিন্তার প্রতি না ঝুঁকে নিষ্ঠার সাথে কর্ম করে যায়। কারণ কর্ম সঠিক হলে ফলাফল নিয়ে চিন্তার প্রয়োজন হয় না। এই জ্ঞান ব্যক্তির মানসিক চাঞ্চল্যকে প্রশমিত করে। আমাদের বর্তমান জীবন পূর্বের কোন না কোন বিস্মৃত কর্মের ফল। একথা বুঝতে পারলে জীবনের ভালো মন্দ কোন ঘটনা তার মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করতে পারে না। ব্যক্তি স্থির ভাবে প্রতিটি ঘটনাকে পর্যবেক্ষন করে। কিন্তু কর্মবাদ মানে অদৃষ্টবাদ নয়। এমন নয় যে সমস্ত কিছু কে ভাগ্যের লিখন বলে ব্যক্তি মেনে নেবে। কারণ কর্ম ই ধর্ম। কর্তব্য জ্ঞানে কর্তব্য পালনই মুক্তি লাভের পথ। **গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন কে উপদেশ দেন যে কর্মেই আমাদের অধিকার, কর্মফল আমাদের হাতে নেই। তাই ফলাফলের চিন্তা না করে আমাদের কর্ম করতে হবে।** যেমন একজন যোদ্ধার কর্তব্য অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া। জীবনের ময়দানে প্রত্যেকেই যোদ্ধা। তাই নিজেকে টিকিয়ে রাখার লড়াই টা আমাদের লড়তে হয়। আবার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া টাও আমাদের ধর্ম। কারণ অন্যায়কারী কে প্রতিহত না করলে সে যেমন নেতিবাচক কর্মের দ্বারা নিজেকে বিনষ্ট করবে তেমন নিরপরাধ ব্যক্তি কে অত্যাচারিত হতে দেওয়াও ব্যক্তির নৈতিক অবক্ষয় ঘটায়। **কাজেই কর্মবাদ কোন নৈতিক বাধ্যবাধকতা নয়। এমন নয় যে ব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত কর্মসাধনের অধিকার নেই। কর্মের স্বাধীনতা অবশ্যই থাকবে। তবে এই স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচার নয়।** স্বাধীনতার অর্থ অন্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা। বিবেক বুদ্ধির দ্বারা ন্যায়সঙ্গত আচরণ করাই কর্মবাদের মূল শিক্ষা।

উপসংহার :

পরিশেষে বলা যায় কর্মনিয়ম সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনে মতভেদ থাকলেও ভারতীয় দর্শন কর্মবিমুখ নয়। কর্মই যেমন ব্যক্তিকে বন্ধনে আবদ্ধ করে তেমন কর্মের মাধ্যমেই ব্যক্তির মুক্তি ঘটে। জীবকে কর্মের ফল কে প্রদান করে এই প্রশ্ন কে কেন্দ্র করে দর্শন সম্প্রদায় গুলো এক মত হতে পারেনি। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন ঈশ্বরবাদী হওয়ায় তারা কর্ম নিয়মকে ঈশ্বরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলে মনে করে। অন্যদিকে বৌদ্ধ, জৈন ও মীমাংসা দর্শন কর্ম কে স্বনিয়ন্ত্রিত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। তারা মনে করে কর্মবাদকে ব্যাখ্যা করার জন্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন নেই।

আধুনিক নৈতিক দর্শনে কর্মফল দাতাকে কোন অধিবিদ্যক শক্তি হিসেবে না দেখে বিবেকের অনুশাসন রূপে দেখা যেতে পারে। ভালো মন্দ উভয় কর্মই মানুষের অবচেতন মনের ওপর গভীর ছাপ ফেলে। যা ব্যক্তির মানসিক শান্তি অথবা বিপর্যয়ের কারণ হয়ে ওঠে। সুতরাং বিবেকই আসলে তার কর্মফল দাতা।অবিদ্যা বা অজ্ঞান দুঃখের মূল কারণ হলেও নৈতিক জীবন যাপন ব্যক্তির আত্মিক শুদ্ধতা নিয়ে আসে। মন শুদ্ধ না হলে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। তাই নৈতিক জীবন যাপন ই মুক্তির সেই সিঁড়ি অবিদ্যা বা অজ্ঞান দূর করতে গেলে যার সাহায্য নিতেই হয়। তাছাড়া আরো যে প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায় তা হলো কর্ম নিষ্ফক

নৈতিক বাধ্যবাধকতা নয়। অর্থাৎ এমন নয় যে কেবল পাপ পুণ্যের ভয়ে মানুষ নৈতিক জীবন যাপন করে। মানুষ নৈতিক জীবন যাপন করে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে। মানুষ হিসেবে নিজের ও সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতা থেকে।

তথ্যসূত্র :

১. Sen, D. (1955). ভারতীয় দর্শন [Bharatiya darshan]. Banerjee Publishers.

২. Sharma, C. (2016). A critical survey of Indian philosophy. Motilal Banarsidass Publishers.

৩. Bhattacharyya, S. (2020). স্নাতক নীতিবিদ্যা [Snatak nitibidya]. Book Syndicate Pvt. Ltd.

TGJCT
EST. 2025